

# দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই

[ প্রত্যেক ভারতীয়ের পড়া অবশ্য জরুরী ]

শিবপ্রসাদ রায়

প্রাপ্তিস্থান

**বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র**

৬ বক্ষিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

মোবাইল : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

## শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯)

### লেখক পরিচিতি

শিবপ্রসাদ রায়-এর জন্ম ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ছোট্ট শহর কালনায়ে। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষা যা বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তাঁর শিক্ষা দীক্ষা একরকম স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয়, বাস্তবজীবন থেকেই তাঁর শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

হিন্দু সমাজের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় তিনি ব্যথিত, বিষাদে ক্রিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশনা, জনসভায় বক্তব্য রাখা ছাড়াও হিন্দু সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজী হিন্দী তামিল, মারাঠী, গুজরাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলি ছিল অত্যন্ত সবল, সহজবোধ্য এবং মর্মস্পর্শী ও অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।

হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনবদ্য। তাঁর আদর্শবাদ, সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাঁর নিবন্ধ এবং বক্তব্য ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 'আপৎকালীন' সময়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে 'সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর জীবনাবসান হয়।



## কিছু পড়ার মত বই যা থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন

হে ভারত ছলিও না (স্বামীজির জীবনী ও টিকাগো বস্তুতা)	১৫.০০
স্বামীজির হিন্দু রাষ্ট্র চিন্তা (স্বামীজির রচনাবলীর সংকলন)	২৫.০০
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ডাঃ ধর্মেন্দ্র চৌধুরী	৬০.০০
মুক্তি যুদ্ধের মহানায়ক নেতাজী	২৫.০০
সবার নেতাজী (শতবর্ষের আলোকে)	১৫.০০
নোষ্ট্রাদামের সেকু রী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ	৮.৫০
দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ড জ্ঞান চাই	৩.৫০
আসুন আমরা সবাই মিলে R.S.S. কে খতম করি	২.০০
অমৃতাবেশ, কিনাযুদ্ধে ভারত দখল	৫.০০
আমরা ও তোমরা	২.৫০
হুগলাদ্য নেতৃত্ব ও কাম্বীর	৬.৫০
ইসরায়েলের ইতিহাস	১২.০০
গণতন্ত্রে শূনের অধিকার এবং... (তথাগত রায়)	৩.৫০
মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা	৩০.০০
বরদীয়ারদের পদপ্রান্তে	৪০.০০
বুদ্ধিজীবী সমীপে	৫.০০
নোগ্রাখালি নোগ্রাখালি	৬.০০
একটি সেমিটিক ধর্ম ও তার সমীক্ষা	৫.০০
সংবিধান ও মুসলিম সমাজ ও সেকুলারবাদ	৬.০০
ইসলামের স্বরূপ	২০.০০
ইসলাম-আরবদের জাতীয় আন্দোলন	২০.০০
কেন উদ্ধাস্ত হতে হল	৮০.০০
ইসলামী ধর্মতত্ত্ব : এবার ঘরে ফেরার পালা (ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী)	১০০.০০
বিশ্ব মনীষীদের চোখে ভারতবর্ষ	১০.০০
শ্যামাপ্রসাদ-বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ (ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিন্ধু)	১৫০.০০
বিশ্ববী বীর সাভারকর (জীবন ও বাণী)	৩০.০০
বাঙালীর পরিভ্রাতা শ্যামাপ্রসাদ	৫০.০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ (তথাগত রায়)	৮০.০০
একটি অকপট জীবনী গান্ধী (রুদ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)	১৫০.০০
'সাম্প্রদায়িক' (অম্বিকাপ্রসাদ পাল)	৫০.০০
নান্যপন্থা (এ)	২৫.০০
অস্তিত্বের সংকটে হিন্দু (এ)	১০.০০
ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত	২.০০
গান্ধী - অতিকথা বনাম বাস্তব (অমিত দাশ)	১০০.০০
দুইবুজ্জি বুদ্ধিজীবী- হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ । (এ) ৫০.০০	৫০.০০

মোবাইল- ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

## দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই

ছোটবেলায় একটা বই পড়েছিলাম, নাম “বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।” বড় হয়েও এদেশের বহু ঘটনার বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। মনে হচ্ছে গোটা দেশের ভাবনা-চিন্তাগুলো যেন একটা অবাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। অবিলম্বে যদি আমরা বাস্তবের মাটিতে পা না রাখতে পারি, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে চরম সর্বনাশ। এদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং মনুষ্যত্বের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করা হা ভারত বিভাগকে। এই ভারত বিভাগ ছিল এদেশের তাবৎ হিন্দু নেতৃবৃন্দের নিবুদ্ধিতার পরিণতি। শতকরা সাতানব্বই জন মুসলমানের দাবী ছিল : হিন্দু মুসলমান দুটো পৃথক জাতি। হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে মুসলমানদের ধর্ম সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব। অতএব আমাদের একটা হোমল্যান্ড চাই, যার নাম পাকিস্তান। মুসলমান সমাজের পুরোটাই যখন ভারতবর্ষকে দুখণ্ড করতে ব্যস্ত, তখন হিন্দু নেতারা কি করছিলেন? জনগণকে বোঝাচ্ছিলেন, হিন্দু মুসলমান পৃথক জাতি নয়। এক জাতি, ভারতীয় জাতি। মুসলীম লীগ এবং মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তানের দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মহাত্মা গান্ধী বললেন : ভারত দ্বিখণ্ডিত হলে তা আমার মৃতদেহের ওপর হবে। পণ্ডিত নেহেরু বললেন : পাকিস্তান ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ননসেন্স। সর্দার প্যাটেল বললেন : ভারত বিভাগ এ তো একটা পরিহাস মাত্র। এমন কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর বিরাট গ্রন্থ “ইন্ডিয়া ডিভাইডেড” লিখে প্রমাণ করলেন, পাকিস্তান একটা অসম্ভব অবাস্তব ব্যাপার। বেশীরভাগ মুসলমান জাতীয়তাবাদী, আর তারা কংগ্রেসের মধ্যে। সুতরাং অদূরদর্শী এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাই পাকিস্তানের কথা বলে আতঙ্ক ছড়াতে চাইছেন। এইসব নেতাদের লক্ষ লক্ষ অনুগামী কোটি কোটি মানুষকে এই মিথ্যে কথাটা বোঝালো। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটেছিল? অসংখ্য প্রাণ, চোখের জল, নারীর সন্ত্রম আর রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান রচিত হল। হিন্দু এবং মুসলমান দুটো পৃথক জাত এই সত্যকে স্বীকার করে ভারতকে



দুভাগ করা হল। দেড় কোটি হিন্দুর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাড়ানো হল পাকিস্তান থেকে। এখনও নিয়মিত তাড়ানো হচ্ছে এবং তাড়ানো হবে।

এখন এদেশের জাতীয় নেতাদের এবং তাদের অনুগামীদের কি বলা হবে? ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, আত্ম-প্রবঞ্চক, অদূরদর্শী, ক্ষমতা লোভী? প্রত্যেকটি বিশেষণ এঁদের কীর্তির উপযুক্ত। কিন্তু আমি তা বলব না। এঁরা লোকান্তরিত তাই এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই বলব, এঁরা ছিলেন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন। এঁদের কোন আচরণই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু তার জীবন উৎসর্গ করেছে স্বর্গীয় প্রেরণায়। মুসলমান তার স্ট্রাটেজী তৈরী করেছে ভারতে মুসলীম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কামনায়। পূর্ববাংলা পাকিস্তান হল মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলে। ফাঁসীর মধ্যে প্রাণদানের সংখ্যা পূর্ববঙ্গের সর্বাধিক। কিন্তু আত্মদানের তালিকায় পূর্ববঙ্গে কেন গোটা বঙ্গেও একজন মুসলমান নেই। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজের সহযোগিতা করে মুসলমানরা পুরস্কার পেল পাকিস্তান, বাংলাদেশ। আর ফাঁসীতে গুলিতে প্রাণ দিয়ে পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুরা হল বাস্তবচ্যুত, শরণার্থী, রিফিউজী। মাতৃভূমি থেকে তাদের পালিয়ে আসতে হল ভারতে। যারা আসামে আশ্রয় নিল তাদের পরিচয় হলো বিদেশী বহিরাগত। যারা বাংলাদেশে রয়ে গেল তারা হয়ে গেল জিম্মি মালাউন কাফের। আর যারা ত্রিপুরায় গেল তারা সংবাদপত্রের ভাষায় হলো অনুপজাতি।

কি করুণ পরিণতি! অথচ শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া একজনও আত্মসম্মান-সম্পন্ন নেতা ছিলেন না গোটা দেশে, এই ঘটনা যাঁকে বিচলিত করেছে। তাঁর প্রচেষ্টায় রক্ষিত হয়েছিল এই পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাব। তাঁকে সবাই বলেছিল সাম্প্রদায়িক। শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরের চূড়ান্ত ভারত ভুক্তি চেয়েছিলেন। ৩৭০ ধারার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। তিনি মধ্যপথে সীজ ফায়ার না করে যুদ্ধ চালিয়ে পুরো কাশ্মীর উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁকে হত্যা করা হলো। যারা কাশ্মীরের অর্ধাংশ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়ে বাকীটাকে প্রায় পাকিস্তান করে রেখে দিল। যাদের জন্য কাশ্মীর আজ অগ্নিগর্ভ তারা প্রগতিশীল ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক। যাঁরা ৩৭০ ধারার উচ্ছেদ করে কাশ্মীর সমস্যার সত্যিকারের সমাধান চায় তাদের সাম্প্রদায়িক বলার মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন নেতারা আজও দেশের নেতৃত্বে। ভারতের অর্ধাংশ কাশ্মীরের অর্ধেক উপটোকন

দেওয়া সত্ত্বেও ভারতে আবার সেই একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কাশ্মীর সবটাই চলে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর আজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কাশ্মীর চালাচ্ছে পাকিস্তান এবং তাদের বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংস্থা।

ভারত আবার খণ্ডিত হতে পারে। বিদেশী অর্থে পুষ্ট হয়ে অধিকাংশ মুসলমান সেই উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলির নির্বিচার তোষণে তারা ক্রমশই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বে-আইনীভাবে সরকারী জমি দখল করে পার্কসার্কাসে অসংখ্য বাড়ী করেছে। রাজাবাজারে গড়ে তুলেছে মসজিদ। '৮৬-তে প্রজাতন্ত্র বয়কট করেছে। দিল্লীর ইমাম বলেছে, আমরা এদেশের আইন-কানুন মানি না। বাবরী মসজিদ না পেলে আবার হোমল্যান্ডের আওয়াজ তুলব। পার্লামেন্টে আগুন লাগিয়ে দেব। উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে দাঙ্গা বাধাচ্ছে মীরাটে, আলিগড়ে, দিল্লীতে, বরোদায়। এই অবস্থাটা বুঝে যারা কিছু বলতে যাচ্ছে তাদেরই বলা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক। এই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নেতাদের অর্ধেক ভারতবর্ষ হারিয়েও কাণ্ডজ্ঞান ফেরেনি। হিন্দু মুসলমানের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হল। কিন্তু এ দেশের নেতাদের একজাতিতত্ত্বের মিথ্যে নেশাটা কাটাল না। পাকিস্তান হিন্দু শূন্য, বাংলাদেশ প্রায় হিন্দু শূন্য, কিন্তু লোক বিনিময়ের মতো একটা বাস্তব সমাধান হাতের কাছে পেয়েও তা ব্যবহার করা হল না। তাই যে মুসলমানরা হিন্দুর সঙ্গে থাকলে ধর্মবিপন্ন হবে বলে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল, তারা ভারতেই রয়ে গেল। তাদের কিছু হারাতে হল না। পাকিস্তান, বাংলাদেশ রইল তাদের ফিক্সড ডিপোজিট। ওগুলো মুসলীম রাষ্ট্র। ওখানে কারো হাত দেওয়া চলবে না। ভারত হল যৌথ সম্পত্তি। এখান থেকে যতটা পারো লুটে নাও। ভারতকে দু-টুকরো করার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান হল মুসলীম রাষ্ট্র। ভারত কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্র হল না। হিন্দু রাষ্ট্রে অন্য কোন ধর্ম বিপন্ন হয় না।

নেপাল হিন্দুরাষ্ট্র, সেখান থেকে একটি মুসলমানকে পালাতে হয়নি। কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশের হিন্দুরা বলির পাঁঠার মতোই অসহায়। যখন খুশী তাদের ওপর অত্যাচার করা যায়। বিতাড়িত করা যায়। যে কোন হিন্দু নারীকে ইচ্ছা করলেই অপহরণ করা যায়। বিবাহ করা যায়। ভারতের একজন মুসলমানেরও কিন্তু এ জন্য কষ্ট হয় না। কোনদিন একটা মৌখিক প্রতিবাদ করে না। এই সেদিন পঞ্চাশ হাজার চামকা হিন্দুকে চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হল। বাংলাদেশ তাদের ফিরিয়ে নিতে

চাইছে। তাবা ভয়ে ফিরতে চাইছে না। কারণ ইসলামিক রাষ্ট্র মানে কি তারা জানে।

ভারতে সেই শতকরা সাতানব্বই জন পাকপন্থীই রয়ে গেছে। ধর্মসংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেই। এরা মুজিব মারা গেলে খুশী হয়। ভুট্টোর ফাঁসী হলে বাস পোড়ায়, সিনেমা হল পোড়ায়। ক্রিকেট, হকিতে পাকিস্তান জিতলে রেডিওতে মালা দেয়। রাজাবাজারে, পার্কসার্কাসে ব্যান্ড বাজিয়ে মিছিল বার করে। ফুটবলে মহামেডান স্পোর্টিং জিতলে আল্লা হো আকবর ধ্বনি দেয়। এই সব আচরণের একটাই অর্থ, এদের অধিকাংশেরই আনুগত্য দেশের বাইরে। লখনউয়ের মুসলমানেরা ইরাক কিংবা ইরানের সমর্থক। বাড়ীতে বাড়ীতে খোমেইনি আর সাদ্দাম হোসেনের ছবি। ওখানে প্রায়ই যে শিয়া সুন্নীর প্রাণঘাতী সংঘর্ষ হয় তা আসলে ইরাকপন্থী এবং ইরানপন্থী মুসলমানের সংঘর্ষ। এখন যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন তোলে, ভারতবর্ষে ভারতপন্থী মুসলমান কই? সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ সেই ব্যক্তিকে বলেন সাম্প্রদায়িক। কেন বলেন? এরা দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে। এদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল তিনটি মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এই তিনটি আদর্শই নির্ভরশীল গরিষ্ঠ হিন্দু জনসংখ্যার ওপর। ভারতীয় উপমহাদেশের যেখানে হিন্দুর সংখ্যা কম হয়ে গেছে, সেখানেই এগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশে এসব কথা বলার লোক আর নেই। আফগানিস্তানের নাম একদিন গান্ধার ছিল, দেশটা হিন্দুদের ছিল, ভারতের অংশ ছিল এই কথাটাই অনেকের মনে নেই। কাশ্মীরে একটাকা কেজি চাল খাইয়ে দুটাকা কেজি চিনি খাইয়ে এবং এম.এ. ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যন্ত বিনা পয়সায় পড়িয়েও সেখানে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্র, গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র সবই অচল। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি চেপ্টা করলেও এক ইঞ্চি জমি কিনতে পারবেন না। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় পশ্চিম পাঞ্জাবের হাজার বিশেক হিন্দু মুসলমানদের হাত থেকে প্রাণ বাচানোর তাগিদে পালিয়ে এসেছিল কাশ্মীরে। তাদের সংখ্যা এখন পঁচাত্তর হাজার। তাদের আজ পর্যন্ত নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। তারা কাশ্মীরে অবাস্তিত।



শেক আব্দুল্লাহর আমলে কাশ্মীরে একটা বিল এলো, যাতে পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অথচ পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সম্পত্তি মানে শত্রুর সম্পত্তি। প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে ‘এসমা’ প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু কাশ্মীরে পারেন নি। এ ব্যাপারে সব রাজনৈতিক নেতারাও নির্বাক। দেশদ্রোহীতার অপরাধে যাকে এগারো বছর জেলে রাখতে হয়েছিল, এবং যার হাতে শ্যামাপ্রসাদের খুনের রক্ত লেগে আছে সেই শেখ আবদুল্লাহকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হয়। আবদুল্লাহ মারা গেলে ফারুককে। শুধু সেখানে হিন্দু সংখ্যালঘু বলে। গত কয়েক বছরে কাশ্মীরে তিনশো হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। তিনলক্ষ হিন্দুকে বিতাড়িত করা হয়েছে। সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়েছে। দেশের অধিকাংশ নেতা এই ঘটনা জানেন কিন্তু তাঁরা সকলেই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, তাই প্রতিবাদ করার মতো কাণ্ডজ্ঞান তাঁদের হয়নি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটি সমীক্ষায় হিসাব কষে দেখিয়েছে মুসলমানদের অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার এবং বিপুল অনুপ্রবেশ দুহাজার সালের মধ্যেই ভারতে হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে দেবে। ব্যাপকভাবে হিন্দুদের গণধর্মাস্তুর করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে কোটি কোটি টাকা আসছে। একথা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের। হাজার হাজার বছরের মীনাক্ষীপুরমে মাত্র সাড়ে আটশো হিন্দু মুসলমান হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা হয়ে গেল রহমতনগর। ভারতে হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে গেলে ভারত আর ভারত থাকবে? এই ছোট কাণ্ডজ্ঞানের কথাটা দেশের দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ধর্মীয় গুরু, রাজনৈতিক নেতা, সাধু-সন্ত, বুদ্ধিজীবী কারো মাথায় ঢুকছে না। বরং তারা এ বিষয়ে আরো গোলমাল পাকিয়ে দিচ্ছে নানাভাবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের একটি সম্মেলন হয়েছিল বেলুড়ে ১৯৮১ সালে। তিনদিন ধরে আলোচনা হল কি করে সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় করা যায়। এই দায়িত্বটা যেন শুধু হিন্দুদেরই। শিলং-এ খ্রীষ্টানদের হাতে মিশনের সন্ন্যাসী মার খেলেন সে কথা আলোচনা হল না। চেরাপুঞ্জির রামকৃষ্ণ মিশনে জলের পাইপ কেটে দিল। কত ভাবে অত্যাচার করল, সে কথা কেউ বললেন না। অন্য ধর্মের হাতে মার খাওয়া আর সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করা এটা এদেশের অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কাজ।



বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বর্ধমান শহর থেকে টেরেসাকে একলক্ষ টাকা তুলে দিলেন। শুধু উপাচার্য নন, মন্ত্রীরা এবং বহু বিশিষ্ট হিন্দু লক্ষ লক্ষ টাকা মহিলাকে সংগ্রহ করে দিলেন। মা করুণাময়ী জগজ্জননী বলে কি নাচানাচিই না হচ্ছে। এই টাকা দিয়ে ইনি এদেশের হাজার হাজার হিন্দুকে খ্রীষ্টান তৈরি করবেন। এই কাজে সাফল্য দেখানোর জন্যই খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলো তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিল। উত্তর পূর্বাঞ্চলে আজ যাবতীয় সমস্যার উৎস এই ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানরা। ত্রিপুরায় কয়েক হাজার হিন্দুকে হত্যা করল ওরাই। এখনও করে চলেছে। নিহত হিন্দুদের জন্য জগজ্জনীর চোখ থেকে এক ফোঁটাও জল পড়েনি। কলেজ স্ট্রীটের এক ছোট ব্যবসায়ী বিবাহের জন্য একটি অনাথিনী মেয়ে চেয়েছিল জননীর কাছে। জবাব এলো খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে তবেই মেয়ে পাওয়া যেতে পারে। এই হচ্ছে মাদারের আসল পরিচয়। খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। খ্রীষ্টান না হলে তিনি কারো স্থায়ী সেবা করেন না। বাংলাদেশ টেরেসাকে প্রবেশের অনুমতিই দিল না। আর এই হিন্দু সমাজ। গরু যেমন গরুর মাংস গাড়ীতে করে নির্বিকার চিঙে বয়ে নিয়ে যায়, কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, পরমানন্দে জাবর কাটে, এরাও তেমনি। চৈতন্যহীন, একটা জাত। ভালমন্দ বিবেচনা করার শত্রু-মিত্র চেনার ক্ষমতাও আর তাদের নেই। হিন্দুত্বের সম্পূর্ণতা, শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

পৃথিবীতে কেউ সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে না। শুধু হিন্দুরা বলে। কিন্তু এ কথা বলতে গেলেও যে আগে হিন্দু ভূমির দরকার, হিন্দু জনসংখ্যার দরকার এই কাণ্ডজ্ঞানটুকুও এদের নেই। বাস্তবতাবর্জিত দিব্যভাব, তুরীয়ভাব, দাঁড়িয়ে গেছে ভণ্ডামি মিথ্যাচারে আর আত্মপ্রবঞ্চনায়। এই দীর্ঘস্থায়ী ভাবের ঘরে লুকোচুরি গোটা হিন্দু জাতটাকে মেরুদণ্ডহীন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করে দিয়েছে। তাই অতীতে, বর্তমানে শুধু দেখি হিন্দু মার খায়, কাঁদে পালায় ধর্মান্তরিত হয়। একটা জাতের যদি আত্মরক্ষার শক্তিই না থাকে, তার উচ্চ দর্শন, সহস্র মহাপুরুষ থেকেই বা কি লাভ? এই রকম দুর্বল জাতকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, করুণা করে। এখন হিন্দুদের কেউ করুণাও করে না। শিকার বলে মনে করে। সব শিকারীর লক্ষ্য এখন হিন্দু সমাজ। সেবা আর প্রলোভনের টোপ হাতে নিয়ে হাজার হাজার শিকারী হিন্দুদের শিকার করতে এসেছে, আসছে।

খ্রীষ্টানরাষ্ট্র, মুসলীম রাষ্ট্রগুলি থেকে টাকা, কর্মী ভারতে আসে কোন্ সাহসে? কারণ তারা জেনে গেছে কোন ঝুঁকি নেই। হিন্দু বাগাড়ম্বর বিলাসী, শিথিল, ক্রয়যোগ্য, উদাসীন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, নিজেকে মনে করে উদার সর্বজ্ঞ। এমন আত্মনাশী জাত বিশ্বের আর কোথায় পাওয়া যাবে? অতএব শিকার কর। আরব রাষ্ট্রের টাকা আসছে ভারতে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা শুধু ঘুরে বেড়ায় হিন্দু-পাড়ায়। তাই এখন এদেশের ধর্মীয় গুরু রাজনৈতিক নেতা এবং জনগণকে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। যোগী, সাধক, ভক্ত, বৈষ্ণব সকলকে মনে রাখতে হবে, জপ করুন, সাধনা করুন, কীর্তন করে কেঁদে ভাসিয়ে দিন, আপত্তি নেই, সর্বাত্মে মনে রাখুন হিন্দু ভূমি, হিন্দু সমাজ, হিন্দু জাতি না থাকলে, কিংবা হিন্দুর সংখ্যা কম হয়ে গেলে ও সব কিছু থাকবে না। রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীদের মনে রাখতে হবে, মার্ক্সবাদ গান্ধীবাদ মমতাবাদ যাই বলুন এ সব তত দিনই বলা যাচ্ছে, যতদিন এদেশে হিন্দু বেশী আছে। মার্ক্সবাদে সুপণ্ডিত কিংবা গান্ধীবাদের তাত্ত্বিক নেতাদের মনে রাখতে হবে, তাঁদের সব তত্ত্বজ্ঞান মূল্যহীন হয়ে গেল, পূর্ববঙ্গে হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে গেল বলে। প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্ত এখানে যত গর্জনই করুন তিনি ভাবতেই পারেননি তাঁর স্বপ্নের মার্ক্সবাদ জন্মভূমি ফরিদপুরে গিয়ে প্রচার করবেন। প্রফুল্ল সেন ভুলেও ভাবেন নি তাঁর জীবনাদর্শ গান্ধীবাদ পিতৃভূমি খুলনায় গিয়ে প্রচারের আর সুযোগ হবে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর শিষ্যদের দাবী, তিনি পুরুষোত্তম, পূর্ণব্রহ্মা। তিনি বহু শিষ্যকে বলেছেন ধর্ম সবই সমান। কিন্তু পাকিস্তান হবার আগেই তিনি সংসঙ্গের মূল আশ্রম পাবনা ছেড়ে পালিয়ে এলেন দেওঘরে। তাঁর দিব্যজ্ঞান তাঁকে দিয়ে অনেক উদার মহৎ কথা বলিয়েছে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান বলেছে : যা পালা হিন্দুস্তানে। যেখানে হিন্দু বেশী আছে। তোর ব্রহ্মের শক্তি দিয়ে তুই এখানে আত্মরক্ষা করতে পারবি না। তাই কাল বিলম্ব না করে তিনি পালিয়ে এলেন। হিন্দুর সংখ্যা কম হয়ে গেলে পূর্ণব্রহ্মেরও মর্যাদা থাকে না। এই সরল সত্যটা ঠাকুরের শিষ্যদের সর্বাত্মে বুঝতে হবে।

এই বঙ্গে আর একজন খ্যাতিনাম গুরু ছিলেন। ইনি জন্মসিদ্ধ ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী। জন্ম ঢাকা জেলার মেদিনীমণ্ডল গ্রামে। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হয়ে গেলে তাঁর সিদ্ধাই কোনও কর্মে লাগল না। তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হল কোথায়? যেখানে

হিন্দু বেশী আছে। হিন্দু কম হলে পূর্ণব্রহ্মাও ক্ষমতাহীন। জন্মসিদ্ধ ব্রহ্মচারীও তাই। এগুলো দিব্যজ্ঞানের কথা নয়। রাগের কথাও নয়। প্রমাণিত সত্য। কিন্তু এই আঘাত, পলায়ন থেকে এঁরা কিছুই শিক্ষা নিলেন না। সম্তানদল একটি গানের রেকর্ড বার করেছে যার প্রথমে আজান এবং পরে কথা, যে আল্লা সেই রাম, রামনারায়ণ রাম। আল্লা এবং রামের সহাবস্থান পূর্ববঙ্গে হল না। আল্লার অনুগামীদের দাপটে হিন্দুদের চোদ্দ- পুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে আসতে হল। তার পরেও এই গান নিশ্চয়ই ঔদার্য এবং সহিষ্ণুতার লক্ষণ। কিন্তু এটি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার, আত্মহত্যার লক্ষণও বটে। এত উদার কিংবা ভণ্ড জাত কখনও বাস্তবের সম্মুখীন হতে পারে না। তাই যখনই হিন্দু সমাজের ওপর আঘাত এসেছে এই সব দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মার্ক্সবাদী, পূর্ণব্রহ্ম ঠাকুর, ব্রহ্মচারীরা দিশেহারা হয়ে গেছেন। পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তাঁদের ঔদার্য, পাণ্ডিত্য, বাগ্মীতা, ব্রহ্মত্ব, সিদ্ধান্ত কোনও কাজে লাগেনি।

ভারতে এসে এঁদের প্রথম কাজ ছিল ধর্মের একটা ভিত্তি তৈরি করা। হিন্দু সমাজের সকল সম্প্রদায়কে একটা কমন প্ল্যাটফর্মে আনা। হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। প্রাণের আধার যেমন শরীর তেমনি হিন্দু ধর্মের আধার হচ্ছে হিন্দু জাতি, হিন্দু সমাজ। সংগঠিত হিন্দু সমাজ না থাকলে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী হাজার হাজার ধর্মগুরু, পণ্ডিত রাজনৈতিক নেতা কেউ নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন না। পালাতে হয়, মরতে হয়, ধর্মান্তরিত হতে হয়। এই খণ্ডিত বঙ্গে এখন মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা পঁয়ত্রিশ। এই সংখ্যা একান্তে পৌঁছলেই গান্ধীবাদ, মার্ক্সবাদ, মমতাবাদ, ভজন, কীর্তন, মালা, টিকি মহোৎসব, ভোগারতি সব শেষে হয়ে যাবে। ‘সব ধর্ম সমান’, খেটে খাওয়া মানুষের কোন জাত নেই’, ‘হিন্দু মুসলিম ঐক্য চাই’, ‘এ দেশ ধর্ম নিরপেক্ষ’ ‘এখানে শুধু হিন্দুর কথা বলেছেন কেন’—এসব বলার জন্য তখন কেউ থাকবে না। পূর্ববঙ্গে এই দিব্যজ্ঞানযুক্ত কথা আর কেউ বলে না। বলতে পারে না। রমনার বিখ্যাত কালীবাড়ীটা যখন কামান দেগে চূর্ণ করে ট্যাঙ্ক দিয়ে সমান করা হল তখন কেউ একটা কথা বলেনি। এগুলো ফলিত সত্য। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে হাজার হাজার হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা হলো। সবাই কিন্তু নির্বাক। এই বাস্তব সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আজ সকলকে ধর্মের কথা, রাজনীতির কথা, ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে।



হিন্দু সংগঠিত, শক্তিশালী এবং সংখ্যাগুরু না থাকলে শুধু তার ধর্মই লাঞ্ছিত হয় না, তার জীবন সম্পত্তিও নিরাপদ থাকে না। এ শুধু পূর্ববঙ্গ কিংবা পাকিস্তানের ইতিহাস নয়। এক হাজার বছরের ইতিহাস। গত হাজার বছর ধরে হিন্দুর দেবদেবী যেভাবে লাঞ্ছিত অপবিত্র হয়েছে তাতে দেবতাদের মর্যাদা বাড়েনি। বহু মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আমাদের দেবদেবীর মহিমা শুধু পুঁথিপত্রে, কথাবার্তায়। কথাটা মিথ্যে নয়। এদেশে একশ বছর আগে জনসংখ্যা ছিল ত্রিশ কোটি, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। অর্থাৎ একটা দেবতা একজন মানুষের কল্যাণ করলেও আমরা তিন কোটি দেবতাকে বিদেশে কল্যাণের জন্য রপ্তানি করতে পারতাম। তাহলে এদেশে এত রোগ, শোক, দারিদ্র, অশিক্ষা, ভণ্ডামী, দুর্নীতি, স্বার্থপরতা কেন? এ দেশে মঠ মন্দিরের সংখ্যা চৌত্রিশ লক্ষ, সাধু সন্ন্যাসী, মোহান্ত, পণ্ডিত, পূজারীর সংখ্যা আটাল্ল লক্ষ। এঁদের দায়িত্ব হিন্দু সমাজকে অভয় দেওয়া সাহস যোগানো।

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এঁরাই ভীত সম্ভ্রান্ত সংকুচিত মাত্র কয়েক হাজার দেশী বিদেশী মৌলভী আর পাদ্রীদের সামনে। কেন? কোথাও নিশ্চয় ফাঁকি আছে। আসলে জাত হিসেবে আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর ফাঁকিটা সেখানেই। সাধু-সন্ন্যাসী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত, পুরোহিত যাই হোন না কেন বেশীর ভাগ হিন্দুর জীবন আত্মকেন্দ্রিক। ব্যক্তি এবং পরিবারকে কেন্দ্র করেই তার সব চিন্তা ও কর্ম সীমাবদ্ধ। জীবনীশক্তির সবটুকু এতেই ব্যয়িত। মানুষের ওপর তার বিশ্বাস নেই, সোজাসুজি ঈশ্বর, গুরু, জ্যোতিষীর ওপর নির্ভরশীল। হিন্দুর জীবনচর্যায় রাষ্ট্র নেই, সমাজ নেই, দেশ নেই। এটাই বৃহৎ ফাঁকি, এই ফাঁকিই সমগ্র হিন্দু সমাজকে স্ববিরোধী, আত্মবিশ্বাসশূন্য করে দিয়েছে। হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজকে তারা সংকীর্ণ কাজ মনে করে। অথচ তাদের দিন কাটে জীবন কাটে ইউনিয়ন রাজনীতিতে গ্রুপিং করে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, জাতপাত, দলাদলি, ভেদ-বুদ্ধি, ঈর্ষা আর পরচর্চার পূর্ণ উদ্বেজনায়।

পাড়ায় বন্ধু নেই, প্রতিবেশীর সঙ্গে মামলা চলছে, নিজের বাবাকে খেতে দেয় না, সাঁইবাবার ভজনা করছে। গর্ভধারিণী মা ভিক্ষে করছে আর ছেলে তারাপীঠ ঠনঠনিয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে মা মা চীৎকার করে। এরাই রাজনীতিতে হিন্দু মুসলীম ঐক্যের আওয়াজ তুলছে। দুনিয়ার শ্রমিককে এক করার কথা বলছে। হীন



প্রবৃত্তিপরায়ণ, স্বার্থপর হিন্দু, ভগবানকে পর্যন্ত নির্বোধ ভাবতে শুরু করেছে। তাই সকলকে বঞ্চিত করে জপে, কীর্তনে পূজায় ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাইছে। স্ববিরোধী মানুষের দিব্যজ্ঞান থাকে, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ভণ্ডামী করে তাদের বেঁচে থাকতে হয়। স্ববিরোধী জাতের পায়ের তলায় মাটি থাকে না। আমাদের ধর্ম রাজনীতি সব কিছু একটা অবাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। তাই হিন্দুদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ অংশটাই দাঁড়িয়ে মার খাওয়ার ইতিহাস।

গৌরাঙ্গদেব বলে গেলেন : ‘ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর’ এ যুগের মহামন্ত্র। আমরা পাগলের মত নাম-গানে মেতে গেলাম। তিনি বললেন : ‘সম্মত শক্তি কলৌযুগে’। কলিযুগে সম্মত শক্তি ছাড়া বাঁচা যাবে না। সে কথাটা ভুলেই গেলাম। আমাদের একটা দেবতা নেই যার হাতে অস্ত্র নেই। অথচ যে কোন হিন্দু বাড়ীতে দেখা যাবে একদঙ্গল ঠাকুর দেবতা আছেন। একগাছা লাঠি নেই। বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কাছে দরিদ্ররা সারা বছর উপেক্ষিত। শুধু বন্যায় দুর্যোগে দরিদ্ররা নারায়ণ হয়। ভাল কথা। কিন্তু বিবেকানন্দ যে বলে গেলেন : ‘সমাজকে সংগঠিত করা দরকার। আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের আরাধ্য দেবী হোক ভারতজননী’ অর্থাৎ রাষ্ট্র সাধনা। সে কথা সযত্নে বাদ দিলাম, মূল গাছটায় জল না দিয়ে আমরা শুধু ডালপালার সেবায়ত্ত্ব করে চলেছি। ফলে গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। জাত বাঁচলে, রাষ্ট্র বাঁচলে আমরা সবাই বাঁচব। সকল চিন্তাশীল মানুষের ভাবনা চিন্তাগুলো এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে করতে হবে।

ভারতবর্ষে তাই এখন সবচেয়ে প্রয়োজন, ইতিহাসসম্মত বুদ্ধি-গ্রাহ্য কাণ্ডজ্ঞানযুক্ত কাজ হচ্ছে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত করে হিন্দুদের একটা বিশাল শক্তিতে পরিণত করা। রাজনীতি যাদের ব্যবসা তাদের জন্যও এটা দরকার। হিন্দু সমাজ না থাকলে তাদের ব্যবসা অচল হয়ে যাবে। কোন অসাম্প্রদায়িক দলও মুসলমান এলাকায় হিন্দু প্রার্থী দাঁড় করাতে সাহস পায় না। মুসলমানদের মধ্যে যারা দেশপ্রেমিক উদারপন্থী আছেন, তাদের জন্যও হিন্দু সমাজের সংগঠিত থাকা দরকার। এম.সি. চাগলার মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মুসলমান সমাজে কোন স্থান ছিল না। ইরানে কিংবা পাকিস্তানে থাকলে তাঁকে কোতল করা হত। হিন্দু সমাজ তাঁকে সম্মান দিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে। সঙ্গীত

সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে, হিন্দুরা শ্রদ্ধায় ভালবাসায় আপন করে নিল। অথচ সুর আমার কাছে প্রার্থনা, সঙ্গীত আমার কাছে ঈশ্বর', বলায় পাকিস্তানে দাবী উঠল নূরজাহানকে নতুন করে মুসলমান হতে হবে।

দাউদ হায়দার নামে একজন বাংলাদেশী কবি মহম্মদের সমালোচনা করায় তার প্রাণদণ্ডের দাবী উঠেছিল। তাকে পালিয়ে এসে আত্মরক্ষা করতে হয় ভারতে। ভারত মুসলিম রাষ্ট্র হলে তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে যে কোন সময় মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে। যেমন বিহারে আবদুল গফুর, মহারাষ্ট্রে আন্তুলে, রাজস্থানে বরকতউল্লাহ, আসামে আনোয়ারা তৈমুর। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে একজন হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হবে কেউ ভাবতে পারেন? পারেন না। অতএব যা কিছু কল্যাণময় এবং শুভংকর তার রক্ষার জন্যই যে কোন মূল্যে হিন্দু সমাজকে জীবিত রাখতে হবে। যারা হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে চাইছে তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন, সহযোগিতা করুন। 'আর্য্যসমাজ', 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ', 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' সর্বশক্তি দিয়ে হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে এদের গতি বৃদ্ধি করুন। নিজে কপট উদার সেজে এদের সাম্প্রদায়িক বলে আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করবেন না। একটু কাণ্ডজ্ঞান দেখান। আমাদের দিব্যজ্ঞানের ফলে অর্ধেক ভারত আজ পাকিস্তান। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতে পঁচিশ কোটি মুসলমান, এক কোটি খ্রীষ্টান। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ খুব অল্প সময়ে আট লক্ষেরও বেশী মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে এসেছে। আরো আনবে। ইস্কনও কাজ করেছে। ইস্কনের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। যে কাজ আমাদের করা উচিত ছিল সেটা ওরা করে দিচ্ছে। নিজের নীচতা দিয়ে ওদের বিচার করবেন না।

দেশদ্রোহিতার অপরাধে মাইকেল স্কট, ফাদার ফেরারকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। সম্প্রতি ফাদার ডি. সুজাকে গ্রেপ্তার করা হল। বিদেশী এজেন্ট খ্রীষ্টান ফাদাররাই। ইস্কন বিদেশী এজেন্ট হলে সারা পৃথিবী জুড়ে মন্দির করত না। এত কৃষ্ণসাধন করত না। অন্য দিকে বিহার-শরীফে মোরাদাবাদে মটার, বন্দুক তৈরির কারখানা পাওয়া গেল মুসলমানপাড়ায়। লক্ষ্মীয়ে মসজিদে পাওয়া গেল পনেরো হাজার তাজা বোমা, ধানবাদের মুসলিম হোটেল থেকে পাওয়া গেল বাস্ক বাস্ক

জোরালো ডিনামাইট। টনটন আর ডি এক্স রয়েছে মুসলীম মাফিয়াদের হাতে। ধর্ম প্রচারের নামে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের খোলাখুলি রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ অচলায়তন হিন্দু সমাজের টনক নড়িয়ে দিয়েছে। তার লক্ষণ ফুটে উঠেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। বিপুল শক্তি নিয়ে হিন্দু সমাজের জাগরণ ঘটছে।

হিন্দুর শক্তি বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রদ্রোহী ছাড়া কারো আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। হিন্দু কারো মসজিদ ভেঙেছে গীর্জা ভেঙেছে—ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত নেই। কিন্তু আজও একটি হিন্দু নারী মুসলমান দ্বারা অপহৃত হলে হিন্দু মন্দির মুসলমান কর্তৃক ধ্বংস হলে কোন মুসলমান তার প্রতিবাদ করে না। নীরবে সমর্থন করে। এগুলো বিদ্বেষ সৃষ্টি নয় বাস্তব অবস্থার কথা। হিন্দুর বাঁচার কথা। সারাদেশে আইন সকলের জন্য সমান হয়। এখানে মুসলমানদের জন্য বিবাহ আইন পৃথক। হিন্দু বিয়ে করবে একটি, পরিবার পরিকল্পনা করে সন্তান রাখবে দুটি। তাদের শ্লোগান, আমরা দুই, আমাদের দুই। আর একজন মুসলিম বিয়ে করবে চারটি, পরিবার পরিকল্পনা করবে না। তাদের শ্লোগান, আমরা পাঁচ, আমাদের পঁচিশ। এই ব্যবস্থা পাশাপাশি চললে ভারত মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে কত দিন? শুধু কি এখানেই শেষ? শিবঠাকুরের আপন দেশে আইন-কানুন সর্বনেশের মতোই ভারতের ব্যাপার স্যাপার।

যে মুসলমানের কাছে বিবাহের কোন পবিত্রতা নেই স্থায়িত্ব নেই। আজ বিয়ে করে কাল তালাক দিয়ে পরশু নিকাহ করতে পারে। তিনি বিবাহ করতে পারবেন চারটি। আর যে হিন্দু বিশেষ কারণ না ঘটলে কিছুতেই দুটো বিয়ে করবে না, নিয়ন্ত্রণ আনা হলো তার জন্য। এই সেকুলারিজমের আরও মহিমা আছে। হিন্দু দুটি বিয়ের চেষ্টা করলে তাকে গ্রেফতার করতে পারবে তিনটে স্ত্রীর মালিক মুসলীম পুলিশ অফিসার। তাকে বিচার করে সাজা দিতে পারবে চারটে স্ত্রীর মালিক মুসলমান বিচারপতি। সাজাটি কি? সাতবছর সশ্রম কারাদণ্ড। জানি বিশ্বাস হচ্ছে না। বিশ্বাস না হওয়ার কারণ—নেতা, সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবীদের কল্যাণে জনগণকেও ক্রমশঃ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এদেশের সব দলের নেতারা ই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নয়তো আরবের অর্থপুষ্টি।



এখন তো প্রমাণিত বিজেপি ছাড়া সব দল দাউদ, মেমন, রশিদের এজেন্ট। তাই প্ল্যান করে তারা দেশটাকে মুসলমানদের করে দিতে চাইছে। যারা এই সত্য কথাগুলো জনসমক্ষে বলছে, আরবীয় এজেন্টরা তাদের সাম্প্রদায়িক বলে নিজেদের মুখ রক্ষা করতে চাইছে। এই দ্বিমুখী চক্রান্তের প্রতিরোধ করে দেশকে বাঁচাবে কে? হিন্দুর সম্ভবত্ব শক্তি। পাকিস্তানে, বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক বিবি নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, এখানে হবে না কেন? কাণ্ডজ্ঞানহীন নেতৃত্ব রয়েছে বলে? নেতারা নৈবেদ্যের ওপর মণ্ডার মতো। আমরা হচ্ছি নৈবেদ্যের চাল। হিন্দু সমাজ গা ঝাড়া দিলেই এই স্বার্থপর হিন্দু বিরোধী মণ্ডারুপী নেতারা অদৃশ্য হয়ে যাবে। পরিবার পরিকল্পনা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করার এবং হিন্দু কোড বিল তুলে দেবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে চাপ দিন। নেতারা হিন্দুর সেন্টিমেন্টের কোন পরোয়াই করে না। তারা জানে হিন্দুরা অসংগঠিত আত্মবিস্মৃত। হিন্দুদের অপমান করে স্বার্থক্ষুণ্ণ করে বহাল তবিয়ে নেতাগিরি করা যায়। তাই শুধু মুসলমানদের তুষ্ট করে, তোষণ করে, হিন্দু কোড বিল চালু রাখে। গো হত্যার পক্ষে কথা বলে, শাহবানু মামলার রায় পাল্টে দেয়। রামের মন্দির ভেঙ্গে বাবরের তৈরি মসজিদ বিলুপ্ত হলে সবাই বৎস হারা গাভীর মত হয়ে যায়। হিন্দুর উপর প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠে। রামচন্দ্রকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্র বলে বাবরকে বেশী মর্যাদা দেবার চেষ্টা করে। এরাই বাংলাদেশ থেকে হিন্দু শরণার্থী আত্মরক্ষা করার জন্য ভারতে এলে পুশব্যাক করে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেয়, ভারতে থাকতে দেয় না।

বিদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমান হলে একটি কথাও বলে না। বাংলাদেশ থেকে এক কোটি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। একথা বলছে ঢাকার সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীরা। মেটিয়াবুরুজ, পার্কসার্কাস, মুর্শিদাবাদে কাতারে কাতারে ঢুকেছে। শুধু কলকাতায় চার লক্ষ বিদেশী মুসলমানদের হিসেব আছে সরকারের খাতায়। ধর্মতলায় ব্যাগ বিক্রেতাদের কিম্বা হাওড়ার সাবওয়ার আশেপাশে তাকালেই এদের দেখা যায়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এদের প্রশয়দাতা। সি.পি.এম. রেশন কার্ড করে দিচ্ছে তো কংগ্রেস ভোটের লিস্টে নাম তুলে দিচ্ছে। শুধু লক্ষ্য সামনের নির্বাচন। কলকাতায় হকার উচ্ছেদ করতে গিয়ে



জ্যোতি বসু সব হিন্দু হকারদের তুলে দিলেন। বাংলাদেশ থেকে আসা বিহারী মুসলমানদের তুলতে পারলেন না। তাদের পিছনে এসে দাঁড়ালেন মিঞা কলিমুদ্দিন। তখন ডেপুটি স্পীকার এখন খাদ্যমন্ত্রী মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি। প্রত্যেকটি মিটিংয়ে বলেন, আমি আগে মুসলমান, পরে ভারতীয়। এই কথায় প্রতিবাদ করতে পারে কোন দলে এমন নেতা নেই।

সুতরাং আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে কাদের হাতে আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ তুলে দিয়েছি : ভাবতে, বুঝতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দেবী হলে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। ধর্মগুরু, রাজনৈতিক নেতাদের মতো সাহিত্য সাংবাদিকতার জগৎটাও আজ নিয়ন্ত্রণ করেছে, দিব্যজ্ঞানী ও স্বার্থাশেষী বুদ্ধিজীবীরা। দেশের ধর্ম সংস্কৃতি, হিন্দুত্বকে আঘাত করা এদের লক্ষ্য। হিন্দু সমাজের সর্বনাশ করে এরা মানবতাবাদী সাজতে চায়। দেশের ছদ্ম বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিহীন অর্থহীন প্রবন্ধ লেখে সংবাদপত্র হিন্দু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিন্দু-সংগঠনের বিরুদ্ধে। আহাম্মুকের মতো লেখে হিন্দুরাষ্ট্রের কথা বললে শিখেরা বৌদ্ধেরা পৃথক রাষ্ট্র চাইবে। মুসলমানেরা আলাদা রাষ্ট্র চাইবে। এই হতভাগ্যেরা ভারতের সংবিধানটা একবার খুলে দেখে না। যাতে লেখা আছে শিখ বৌদ্ধ জৈন এরা হিন্দু সমাজের অন্তর্গত। এরা স্মৃতিভ্রংশ অথবা শয়তান। নইলে এদের মনে পড়ত শতকরা ২৩ ভাগ মুসলমান ভারতের ৩০ ভাগ জমি নিয়ে পাকিস্তান তৈরি করেছে। তারপরেও দেড়কোটি হিন্দুকে তাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু জমি দেয়নি।

এদেশের কিছুতকিমাকার রাজনৈতিক নেতারা এবং অপদার্থ বুদ্ধিজীবীরা বড়োই বিচিত্র। এরা হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা দশ লক্ষ প্যালেস্টাইনী মুসলমান উদ্বাস্তুদের জমি দেবার জন্য সহানুভূতি দেখাতে পারেন। সরকার আর্থিক সাহায্য দিতে পারে। নির্জোট সম্মেলনের নেতা রূপে তাদের জন্য বিশ্বজনমত তৈরি করতে পারে, পারে না শুধু অন্যায়ভাবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া দেড় কোটি হিন্দুর জন্য ন্যায়ত আইনত প্রাপ্য জমি চাইতে।

বঙ্গসেনা, বি.এল. ও বাংলাদেশের আটটি জেলা নিয়ে স্বাধীন ভঙ্গ-ভূমির দাবী করছে। তার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন করছে। জনমত এই দাবীর পিছনে সংহত হলেও, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি হিন্দু এই আন্দোলনে আশার আলো

দেখলেও ভারতের সংবাদপত্র নির্বাক। নেতারা, পণ্ডিতেরা বলতে পারছেন না এদাবী ন্যায্য আইনসংগত এবং মানবিক দাবী। অনেক আগে এই দাবী উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল। রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবীরা এসব ভাবতে পারেন না। রুগ্ন পরাজিত বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা ভাবেন এসব বললে ভারতের মুসলমানেরা আবার যদি রাষ্ট্র চায়। এঁরা ভুলে যান যে, মুসলমানেরা দেশ ভাগ করে নিজেদের রাষ্ট্র বুঝে নিয়েছে। যতটা জমি পাওয়া উচিত তার বেশী জমি নিয়েছে। অতএব মুসলমানেরা আবার রাষ্ট্র চাইলে তাদের সীমান্ত পার করে দিতে হবে। এটাই হচ্ছে যুক্তি এবং ইতিহাসের শিক্ষা।

কাণ্ডজ্ঞানহীন পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা এ শিক্ষা নেয় না, তারা গোটা দেশকে বিভ্রান্ত করে। সর্বনাশ আড়াল করতে চায়, হিন্দু বিরোধিতায় উৎসাহ প্রদান করে। কোরান না পড়ে ইসলামকে না জেনে অকারণে তার প্রশংসা করে। কোরানে ঠিক কি আছে তা নিয়ে কোন বিদ্বৎ লেখক কোনদিন আলোচনা করেন না। কেন করে না? এঁরা সকলেই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে। ‘আনন্দবাজার’, ‘আজকাল’ অকারণে গরু খাওয়ার পক্ষে ওকালতি করে। বিপক্ষে চিঠি লিখলে ছাপে না। গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে হিন্দুদের ছোট করে দেখানো লেখক বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাশন। প্রগতিশীল হবার তীব্র ইচ্ছা এদের বুদ্ধিকে বিকৃত করে দিয়েছে। এরা জানে ইসলামে গরু কাটার কোন বাধ্যতা নেই।

কোরানের জন্মভূমিতে গরু নেই। অথচ এটা গোপালের দেশ। গরুর প্রতি মানুষের প্রচণ্ড শ্রদ্ধা। গরু কাটলে শতকরা পঁচাশিজন মানুষের প্রাণে লাগে। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেয়ে গোহত্যা বন্ধের প্রশ্নকে আমি বেশী জরুরী মনে করি। নেতাজী ঐক্যের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজে গরু খাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ডাক্তার কর্নেল চ্যাটার্জী তার লেখা বইয়ে একথার উল্লেখ করেছেন। সংবিধানে গোহত্যা বন্ধের নির্দেশ আছে। সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চ গোহত্যা নিষেধের পক্ষে রায় দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট গোহত্যা বন্ধের রায় দিয়েছে। বিনোবা ভাবে গোহত্যা বন্ধ করার জন্য অনশন করে নিজের প্রাণটাই দিয়ে দিলেন। তবু গোহত্যা বন্ধ হল না। পবিত্র সংবিধান, মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট,

হাইকোর্ট, অধিকাংশ মানুষের, শ্রদ্ধাকেন্দ্র— সবকিছুকেই অপমানিত করে পার পাওয়া যায়, কারণ হিন্দু সমাজ অসংগঠিত।

মুসলমানরা সংগঠিত তারা তাদের অন্যায় ইচ্ছাকেও সমর্থন করতে চায়। সহস্র যুক্তি থাকলেও এ দেশের কোন লেখক শুয়োর খাবার জন্য কলম ধরতে পারে না। যাত্রায়, নাটকে, সিনেমায় সর্বত্র হিন্দুর শ্রদ্ধাকেন্দ্রগুলোকে লাঞ্ছিত করা হয়। হিন্দু মুসলমানের মিলন দেখাতে হিন্দুর মেয়েকে মুসলমানে নিয়ে যাবেই। সিনেমায় নায়ক-নায়িকা বিপদে পড়লে শুধু আশ্রয় পায় মসজিদে কিংবা গীর্জায়, হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সন্ন্যাসীদের দেখান হচ্ছে খল চরিত্ররূপে। তাদের কমগুলো মদ, ঝুলিতে গাঁজা, তারা চোরাচালানদার বদমাইস। আর ফাদার এবং মৌলভীরা স্নেহ ক্ষমার প্রতিমূর্তি! শুধু তাই নয় অধিকাংশ সিনেমায় মুসলমান এবং খ্রীষ্টান চরিত্রের মুখে ডায়ালগ থাকে তাদের ধর্মের স্বপক্ষে। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখানো হয় আল্লার মহিমা। যীশুর মাহাত্ম্য। যে কোন মুসলীম চরিত্র নাটকের প্রয়োজনে মারা গেলে ভেসে আসবে করুণ আজানের সুর। পর্দায় ফুটে উঠবে মক্কার কাবা। লক্ষ লক্ষ মুসলমান সেখানে নামাজ পড়ছে।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার। জার্মান নাট্যকার ব্রেখটের নাটক বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে তার মধ্যে ক্লাউনের মতো আমদানী করা হচ্ছে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবকে। তাদের মুখে বলানো হচ্ছে শালীনতাবর্জিত ভাষা। সফোক্লিশের নাটক বাংলা করতে গিয়ে, ইবসেনের নাটক চিত্রায়িত করতে গিয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ পরিচালক অকারণে আঘাত করেছেন শুধুমাত্র হিন্দু সংস্কারকে। গীতিকার শিল্পীরা কৃষ্ণকে নিয়ে গৌরাঙ্গদেবকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ গান রচনা করছে, গাইছে, রেকর্ড বেরুচ্ছে। বিচিত্র এদেশের হিন্দু ধর্মাচরণকারীরা। এসবে তাদের কোনো কষ্ট হয় না। কোন ভক্তের প্রাণে এ সব লাগে না। ভিখারীর বৈরাগ্য, নপুংসকের ব্রহ্মচর্য, শক্তিহীনের ভক্তি এইরকমই হয়। চ্যাংড়া নাট্যকার ফক্কড় সাংবাদিকরাও তার পরোয়া করে না।

এদেশের সাংবাদিককুল হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনে কোথাও দাঙ্গা হলে লেখে, ‘দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ’, দাঙ্গা যাতে না ছড়ায় এই বৃহত্তর স্বার্থে সত্য গোপন করা হয়। ভাল কথা, কিন্তু হিন্দুদের দুটি সম্প্রদায়ে একটু কিছু হলে বিরাট হেডলাইন আসে ‘হরিজনদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের নারকীয় অত্যাচার’—কেন এমন লেখা হয়?



কারণ অধিকাংশ সাংবাদিক হিন্দুত্ব বিরোধী দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন। তারা চায় না হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ হোক, শক্তিশালী হোক। মালদহের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদে লেখা হল ঘোষেদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গা। ঘোষেরা যেন হিন্দু নয়। হিন্দুর সংহতি নষ্টকারী এইসব প্রাণীগুলো আসামের ঘটনা সব জেনেও স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না আসাম আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্রটি কি ছিল। বিভিন্ন ঘটনা, আন্দোলন বহির্ভূত বিষয় নিয়ে সাতকাহন পাঁচালী গেয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন এবারেও সেই আগের মতো বাঙালী বিতাড়ন আন্দোলন। এর আগেও এই সাংবাদিকরা শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন।

বাঙালী বাঙালী করে এরা অস্থির হয়ে যান, কিন্তু আসাম থেকে কোনদিন বাঙালী মুসলমান বিতাড়িত হয়নি কেন? বাঙালী মানে কি শুধু 'হিন্দু বাঙালী'? পূর্ব বাঙলার তো সবাই বাঙালী। দফায় দফায় যারা বিতাড়িত হয় তারা শুধু হিন্দু কেন? এই সোজা কথার জবাব এঁদের কাছে নেই। বাঙালীদের জন্য যাদের বেশী দরদ, যারা বাঙালীর স্বার্থরক্ষায় বাঙালীস্তান গড়তে চায় সেই 'আমরা বাঙালী'ও এ প্রশ্নে নীরব। বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুদের জন্য এরা কোনদিন একটা কথা বলে না। এবারও এঁরা সব সময়ে চেয়েছেন আসামের আন্দোলনকে লঘু করে দেখাতে। এত দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে কখনও হয়নি। সারা দেশের উর্দু পত্রিকাগুলোর আতর্নাদ শুনলেই বোঝা যাবে এই আন্দোলনের লক্ষ্য। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের বিতাড়ন। হিন্দুদের বিতাড়ন নয়।

হিন্দু পৃথিবীর যেখান থেকেই আসুক এখানে সে বিদেশী নয় অনুপ্রবেশকারী নয়, এমন কি শরণার্থীও নয়, এদেশ তার মাতৃভূমি। অসমীয়া হিন্দুরা একথা বুঝেছে, কিন্তু তাদের আরো সক্রিয় হতে হবে। আসামে উনপঞ্চাশ লক্ষ বাংলাদেশী মুসলমানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই অনুপ্রবেশ বন্ধ করতেই হবে। না পারলে আসামের রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। আসাম হবে আর একটা পাঞ্জাব কিম্বা কাশ্মীর। আসামের তরুণেরা এ ব্যাপারে সচেতন সতর্ক হচ্ছে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে এটাই আশার কথা। কিন্তু হিতেশ্বর সাইকিয়া, প্রফুল্ল মহান্তী সরকার সবটাই উল্টে দিচ্ছে।



পাঞ্জাব আজ অগ্নিগর্ভ। সেখানে তৈরী হয়েছে শিখ মুসলিম সুহৃৎ সমিতি। এর পিছনে আছে পাকিস্তান এবং এখানকার মুসলমানদের একটি অংশ। হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে শিখেরা কখনোই এতো নিষ্ঠুর নৃশংস হতে পারে না। তিনশো বছরের শিখ ইতিহাসে এরকম নজীরও নেই। নির্মম হিন্দু হত্যায় তাই ফুটে উঠেছে পরিচিত ইসলামিক বর্বরতা। এই বাস্তব অবস্থার ভয়ংকরত্ব এবং সমস্যা সমাধানের কথা কেউ বলতে পারছে না। ঔদার্য নিয়ে, দিব্যজ্ঞান নিয়ে মিথ্যের চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে নিজের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করছে হিন্দুসমাজ। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা নিরীহ, উদার পরমতসহিষ্ণু মনুষ্যগোষ্ঠী। যারা শুধু সর্বমানবে নয়, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রতিটি ধূলিকণায় ঈশ্বরকে কল্পনা করেছে। মানবাত্মার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে যাদের ধর্ম-দর্শনে, সেই হিরণ্ময় ঐতিহ্যের ধারক হিন্দুসমাজ আজ বিপন্ন। তথ্য-প্রমাণ-যুক্তির আলোয় এই কঠিন সত্য নগ্নভাবে প্রকটিত। যতদূর সম্ভব ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত করে হিন্দুত্বকে বাঁচানো আজকের হিন্দুদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।

যে যাই বলুন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের মূল ধারা মানে হিন্দু ধারা। হরিদ্বার থেকে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছাতে গিয়ে গঙ্গায় অনেক নদী এবং নর্দমার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাতে গঙ্গার স্বকীয়তা, পবিত্রতা নষ্ট হয়নি। গঙ্গা গঙ্গাই রয়ে গেছে। হিন্দুও তাই। শক্তির অভাব আমাদের নেই। আছে আত্মিক শক্তি এবং সংখ্যা শক্তি। শুধু নেই আত্মবিশ্বাস এবং সংগঠনশক্তি। ফলে হিন্দু সমাজের অবস্থা অনেকটা উটপাখীর মত। উটপাখী দৌড়াতে পারে ঘন্টায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল। লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দিতে পারে একটা তাজা ঘোড়াকে। পায়ে তার এতো জোর। আত্মবিশ্বাস না থাকার ফলে বিপদ দেখলে প্রত্যেকটি উটপাখী কি করে? চোখ দুটো বন্ধ করে ঠোঁটটা বালিতে গুঁজে দেয়। ভাবে বিপদ এড়িয়ে গেলাম। তখন তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ঘেয়ো কুকুর আর রুগ্ন শেয়ালের দল। যারা তার একটা পদাঘাতের যোগ্য নয়। এ অবস্থা চলতে পারে না। সহ্যের অতীত হিন্দু সমাজ সংগঠিত হচ্ছে জাগ্রত হচ্ছে। হতেই হবে। কারণ লক্ষ লক্ষ বছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ শুভ্র এবং পবিত্র জীবনদর্শনের উজ্জ্বল উত্তরসূরী হিন্দু জাতির ভবিষ্যৎ আমরা কিছু কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজনীতিক বালখিল্য বুদ্ধিজীবী অথবা ভণ্ড ধার্মিকের হাতে ছেড়ে দিয়ে চূপ করে বসে থাকতে পারি না। কারণ এটা হিন্দু জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন।

যদি না পারি? পাঁচিশ বছর পরেই কিছু স্পেসিমেন মনুষ্য আমরা চিড়িয়াখানায় দেখতে পাবো। বাধ্যতামূলক ধর্মাস্তরিত অহিন্দু পিতারা তাদের বালক পুত্রদের হাতে ধরে বলবে : এই দ্যাখ, অতীতে এই দেশে এক ধরনের প্রাণী ছিল এরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর, শক্তিও ছিল যথেষ্ট। এদের নাম ছিল হিন্দু। এদের বেদ ছিল, বেদান্ত ছিল, গীতা উপনিষদ ছিল। মার্ক্সবাদ গান্ধীবাদ ছিল, কিন্তু বাস্তববুদ্ধি ছিল না। তাদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, দিব্যজ্ঞান ছিল শুধু কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। তাই তারা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। দুচারটি প্রাণী মাত্র এখন দেখা যায়, তাই দ্রষ্টব্য বস্তু বলে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছে, মারা গেলে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আরক মাখিয়ে যাদুঘরে রেখে দেওয়া হবে।

দীর্ঘদিনের কলংক কালিমা বাবরী মসজিদ হিন্দুরা ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। বিশাল হিন্দু সমাজে আত্মবিশ্বাস এসেছে।

দুর্নীতি দূষিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির অভ্যুত্থান জাতীয় জীবনে স্বস্তি এনে দিয়েছে।

আর্য্যসমাজ, ভারত সেবাস্রম সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চেষ্ঠায় এ পর্যন্ত পঞ্চাশ লাখ মুসলমান এবং পাঁচ লাখ খ্রীষ্টান হিন্দু সমাজে ফিরে এসেছে।

মীরাতের ইমাম সৈয়দ মেহেবুব আলী, মাদ্রাজের ইমাম শেখ আমীর মহম্মদের মত শতাধিক পণ্ডিত হিন্দু ধর্মের প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারক এ্যাণ্ডারসন মাউরি হিপসন রায় উত্তর পূর্বাঞ্চলে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির প্রসারে ব্যস্ত রয়েছে।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল দাউদ ইব্রাহিম, রশিদ খানের এজেন্ট প্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় তারা সবাই এক হয়ে হিন্দু সমাজ এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের নগরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে হিন্দু সংগঠন এখন ঠিক দাবানলের মতোই ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ঘুমন্ত সিংহ হাই তুলছে। আড়মোড়া ভাঙছে। রাষ্ট্রদ্রোহীরা চিন্তিত হয়ে উঠেছে। হিন্দুর জাগরণের আর দেরী নেই।

## সংযোজন—১

জঙ্গিরা ভারতে এত আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারছে  
কেন? ইতিহাসের পটে সাম্প্রতিক

পবিত্রকুমার ঘোষ

তিন দশক ধরে ভারতের ভিতরে চলছে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। বঙ্কতার বন্যা বয়ে গিয়েছে, শত্রুকে দমন করার জন্য প্রতিজ্ঞা ও পায়তারা হয়েছে যথেষ্ট। তবু ভারতের কালসর্পযোগ কাটেনি। ইন্দিরা গান্ধী বেঁচে থাকতেই যা শুরু হয়েছিল, তার শেষ দেখা যায়নি এখনও। শুধু অসার বাক্যই ভারতের সম্বল।

সর্বশেষ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে ২৫ আগস্ট, হায়দরাবাদে। সন্ধ্যাবেলায় শহরের লুস্বিনী পার্ক ও গোকুল চাটে মানুষের ভিড়ের ভিতর দুটি বিস্ফোরণে মানুষ মরেছিল ৪০ জনের বেশি, আহত অনেক। একই শহরের মক্কা মসজিদে ১৯মে একই ধরনের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছিল ১৬ জন। হায়দরাবাদে শহরে ও তার আনাচে কানাচে জঙ্গিরা কিলবিল করছে বলে গোয়েন্দা পুলিশের ধারণা। তাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক নেতারা ই তাদের পৃষ্ঠপোষক।

পুলিশের এই ধারণা কতটা সত্য, তা ২৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ১৬ দিন আগে হায়দরাবাদেই বোঝা গিয়েছিল। সেদিন ওই শহরে তসলিমা নাসরিন গিয়েছিলেন তাঁর একটি বাংলা উপন্যাসের তেলুগু অনুবাদ প্রকাশের অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল প্রেসক্লাবে।

তসলিমার বঙ্কতা শেষ হতেই রাজনৈতিক পার্টি মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের বিধায়কদের নেতৃত্বে একদল জঙ্গি প্রেস ক্লাবে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে দেয়। আক্রমণ করে, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ঝাঁপিয়ে না পড়লে তসলিমা খুন হতেন। পুলিশ এসে জোর করে তসলিমাকে বিমানবন্দরে নিয়ে এসে সোজা কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়।

সেকুলারবাদী কংগ্রেস এখন অন্ধপ্রদেশের ক্ষমতায়। তাদের আচরণই সবচেয়ে অদ্ভুত, প্রায় অবিশ্বাসযোগ্য। তারা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেছে, জঙ্গিদের কিছুই বলেনি। তারপর সংবাদপত্রগুলিতে বিস্তার লেখালেখি হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস আর রেড্ডি ভালোমানুষের মতো মুখ করে দু-একটি নিন্দাবাক্য খরচ করেছেন।



সেদিনই বোঝা গিয়েছিল, সরকার জঙ্গিদের রক্ষক। লুম্বিনী পার্ক-গোকুল চাটে রক্তবন্যা বওয়ার পর পুলিশ বলেছে, এরকম ভয়ংকর ঘটনা আরও ঘটবে, যখন তখন ঘটবে। কারণ রাজনীতির খেলা এখন এমনই যে, জঙ্গিদের হাতে মানুষ বলি হলেও রাজনৈতিক কর্তাদের কিছু এসে যাবে না, জঙ্গিদের তাঁরা খুশ রাখবেনই।

ইন্দিরা গান্ধী এইভাবেই পাঞ্জাবে উগ্রপন্থী ভিন্দ্রেনওয়ালাকে খুশি রাখতে রাখতে পরিণামে ওই জঙ্গি নেতার অনুগামীর হাতেই খুন হয়েছিলেন। রাজীব গান্ধী শ্রীলঙ্কার এলটিটিইকে মদত দিয়ে পরে তাদের আত্মঘাতী জঙ্গির ঘটানো বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিলেন।

সরকার বা সরকারের ভিতরের কোনও কোনও চক্র নিজেদের স্বার্থে জঙ্গিদের ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বা তাদের আনুকূল্য পাওয়ার আশায় দু'মুখো মনোভাব নিয়ে চলেছে। তারা মুখে সেকুলারবাদ আওড়ায়, কিন্তু আড়ালে মৌলবাদী জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক করে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ। বামফ্রন্ট সরকারের মহান কর্তারা ত্রিশ বছর ধরে এই খেলা খেলতে খেলতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে ভারতের মধ্যে মৌলবাদী জঙ্গিদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটিতে পরিণত করেছেন। ভারতে যেখানে যত বিস্ফোরণ জঙ্গিরা ঘটাবে, সেসবের জন্য মানুষ ও মাল পশ্চিমবঙ্গ থেকেই যায়। এ কথা দিল্লির গোয়েন্দারা জানে ও জানিয়ে দেয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের গোয়েন্দারা চোখে ঠুলি, কানে তুলো গুঁজে থাকে।

তারও কারণ, সরকারের কর্তারা সেরকমটাই চান। এ বিষয়ে জ্যোতি বসুর রেকর্ডই ছিল সর্বোত্তম। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাতেন, বাংলাদেশ থেকে কোনওরকম অনুপ্রবেশই বন্ধ করা যাবে না, কারণ সীমান্তের দু'দিকের মানুষের চেহারা এক, পোশাক এক, ভাষা এক, কালচারও এক। তিনি নিশ্চিত কণ্ঠে একথাও বলতেন, পশ্চিমবঙ্গে কোনও জঙ্গি নেই, পাকিস্তানের আই এস আইয়ের কোনও চক্র নেই, মৌলবাদী চক্রান্ত নেই।

কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম করা হয়ে থাকে। বিশেষত, সিপিএমের শাসনকালে। সরকারের বড়কর্তা যা ইচ্ছা করেন, প্রশাসন ও পুলিশ সেভাবেই চলে। ওই দুই বস্তুর ওপর সিপিএমের ছোট কর্তাদেরও অপ্রতিহত প্রভাব। এই ছোট কর্তারা নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। 'দেশ' বলে তাঁদের কাছে কিছু নেই, টাকা ও ভোটই তাঁদের একমাত্র বিবেচ্য। অনুপ্রবেশকারীদের বৈধ নাগরিকের স্বীকৃতি দিতে তাঁদের আগ্রহ অপরিমিত। সেই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে যদি জঙ্গিরা লুকিয়ে থাকে, তাহলেও।



জ্যোতি বসুর আমলে বড় পুলিশ কর্তারা অনায়াসে বলে দিতেন, এ রাজ্যে কোনও জঙ্গি সমস্যা নেই। দিল্লী থেকে গোয়েন্দাসূত্রে সতর্ক করে দেওয়া হলেও এখানকার মহাপ্রভুরা গা করতেন না। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কিছুটা নড়েচড়ে বসতে চেয়েছিলেন হয়তো, কিন্তু তাঁর পার্টির আশু লাভ যেখানে জড়িত, সেখানে তাঁর হাত চলে না।

ফরওয়ার্ড ব্লক আবার সিপিএমের চেয়েও বড় সেকুলার। তাদের নেতাদের একটা প্রধান কাজ হল, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে উঠতে-বসতে গালমন্দ করা। এই বাহিনী অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া হলেই ফরওয়ার্ড ব্লক চেষ্টা, সীমান্তরক্ষী বাহিনী সীমান্ত এলাকার লোকদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। একবার দিল্লী থেকে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের একটি দলকে ট্রেনে করে পশ্চিমবঙ্গের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল, সীমান্ত পার করিয়ে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে। খজাপুরের কাছে ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীরা তাদের নামিয়ে নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিল। কলকাতার এক ইমাম তসলিমা নাসরিনের মুণ্ডু দাবি করার পর ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ভক্তিপদ ঘোষ লখনউয়ে নয়টি মুসলিম সংগঠনের নেতাদের বলেছেন, তাঁর পার্টি কেন্দ্রকে বলবে তসলিমা নাসরিনকে বাংলাদেশে বিদায় করে দিতে। কারণ এই ভদ্রমহিলা ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে মৌলবাদী মুসলিমদের কৃত হিন্দু নিধন যজ্ঞের বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ‘লজ্জা’ উপন্যাসে। ওই বই মুসলমান ভাইদের বড়ই লজ্জার কারণ হয়ে আছে। সেজন্য সেকুলার ভারতে তাঁকে থাকতে দেওয়া চলবে না; যদিও সবাই জানে, তসলিমাকে ধরে-বেঁধে বাংলাদেশে ফেরত পাঠালে তাঁকে হায়নাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ছোট ও বড় রাজনৈতিক দলগুলির এবং তাদের সরকারের রক্ষাকবচ পেয়ে জঙ্গিরা ভারতকে রক্তে স্নান করিয়েই চলেছে। ২০০৪ সালের জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত জঙ্গিদের হাতে নিহত হয়েছে ৩ হাজার ৬৭৪ জন নির্দোষ নাগরিক। কিন্তু জঙ্গিদের হাতে প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন মোট ৫৫ হাজার জন ভারতীয়। ভারত-চীন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে এর ভগ্নাংশমাত্র মানুষ মরেছিল। জঙ্গিদের আক্রমণে মানুষ মরলে সরকার শুধু দুঃখপ্রকাশ করে, মন্ত্রীরা ‘দেখে নেব’ ভাব দেখান। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পুলিশ ঘটনা ঘটনার পর কতগুলি লোককে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু প্রমাণ জোগাড় করতে পারে না বলে আদালত তাদের ছেড়ে দেয়। সরকার যেসব আইন করেছে তাতে ফাঁকফোকর রেখেই তা করেছে। পোটা আইন তারা তুলেই দিল। পুলিশের দাবি, উপযুক্ত আইনের অভাবে তারা জানা জঙ্গিদেরও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

হায়দরাবাদে পুলিশ বলেছে, কমপক্ষে এক হাজার জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি ওই শহরে রয়েছে। তাদের সাহায্যকারী গুপ্ত সেলও অনেক আছে। তাদের পাকড়াও করলেই পুলিশের কাছে উঁচু মহল থেকে ফোন আসে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। একজন মৌলবাদীকেও গ্রেপ্তার করলে নাকি ভোটবাক্সে ধস নামবে। পুলিশের মতে, মৌলবাদীদের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের মধ্যে যাদের গায়ে যত বেশি, দাগ, তাদের কাছ থেকে তত বেশি লাভ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তাদের ব্যবহারমূল্য তত বেশি। বিনিময়ে তাদেরও স্বাধীন অপারেশন চালাতে দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে এটাই নাকি শান্তি বজায় রাখার সরকারি ফরমূলা। এই রাজ্যকে জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় করে দেওয়া হয়েছে বলেই জঙ্গিরা নাকি এখানে শান্তি বজায় রাখে। সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গিদের নিরাপদতম স্থান। তাই অন্যান্য রাজ্যের মতো বিস্ফোরণ এখানে তারা ঘটায় না। এখানে তারা নাকি স্থানীয় রাজনৈতিক কমরেডদের মাসতুতো ভাই। এই একটি ব্যাপারেই এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির মত অভিন্ন, পথও এক। তাদের সকলের সহযোগিতায় এ রাজ্যে ‘মৌলবাদী জঙ্গি পালন প্রকল্প’ হেসে খেলে চলছে। কোনও জেলা প্রশাসক বা পুলিশ অফিসার যদি এই প্রকল্পে খোঁচা দিতে যান, তাহলে তাঁর বদলি হয়ে যাওয়া অবশ্যস্তাবী।

হায়দরাবাদে বিস্ফোরণের আগেই ওইরকম ঘটনা ঘটতে পারে বলে দিল্লির গোয়েন্দারা অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশকে জানিয়েছিল। সেই সতর্কবার্তা পেয়ে অন্ধ্রের পুলিশ পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন হরকত-উল-জেহাদি (হুজি) এবং কুখ্যাত লস্কর-ই-তোইবার ঘাঁটি ও এজেন্টদের খুঁজতেই তারা এখানে এসেছিল। অন্ধ্রের পুলিশ খবর পেয়েছে, হায়দরাবাদ, বিজেয়ওয়াড়াসহ তাদের রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় বড়সড় হাঙ্গামার ছক পশ্চিমবঙ্গে বসেই তৈরি করেছে হুজি ও তোইবার জঙ্গিরা।

অন্ধ্রের পুলিশ টিম কলকাতার বড়বাজার মেছুয়াবাজার, বনগাঁ, বাগদা, বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ ছাড়াও আরও কয়েকটি জায়গায় হানা দিয়েছিল। তারা এ রাজ্যের গোয়েন্দাদের জানিয়ে গিয়েছে, এ রাজ্য থেকে কিছু মুসলিম যুবক এবং বাংলাদেশি জঙ্গি অন্ধ্র গিয়ে সেখানকার ‘দারুল-উলুম-আল-মাহদি-উলআলিয়ান-ইসলামি’ নামক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে জেহাদি প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এর মধ্যে ২২ আগস্ট দুজন বাংলাদেশি যুবক বনগাঁ দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যায়। তারা হুজির লোক। হায়দরাবাদ পুলিশ মনে করে, ২৫ আগস্ট হায়দরাবাদ বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডা হুজির মহম্মদ শাহিদ ওরফে

বিলাল। সে পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আইএসআই তাকে বাংলাদেশে হজির কর্তা করে দিয়েছে।

ভারতে বিলালের প্রথম অপারেশন হয়েছিল ২০০৫ সালে ১২ অক্টোবর, দশহরার দিন। সেদিন সে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল হায়দরাবাদের পুলিশ কমিশনারের অফিসেই। তার পরবর্তী অপারেশনগুলির মধ্যে আছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার সমঝোতা এক্সপ্রেস, হায়দরাবাদেই মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ ইত্যাদি। যে দু'জন যুবক বনগাঁ সীমান্তে ধরা পড়েছে, তারা এক বছর ধরে হায়দরাবাদের উপরোক্ত দারুল-উলুমে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

কলকাতার চার যুবক, আমির রেজা খান, খুররম খৈয়াম, নিয়াজ হুসেন এবং সাদাকত হুসেনের বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশ জারি করেছে, ইন্টারপোল। কোনও জঙ্গি পাকিস্তানে আশ্রয় পেলে ইন্টারপোলের তোয়াক্কা রাখার দরকরা তার পড়ে না। আমির রেজা ছিল কলকাতার বেনিয়াপুকুরের বাসিন্দা। সে এখন পাকিস্তানে হজির প্রধান।

ঠালায় পড়ে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এখন বেশ কিছু মাদ্রাসার ওপর নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের কাছে রিপোর্ট আছে এই রাজ্যের ১৯টি জেলায় ২৪৭৭টি স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা আছে সীমান্ত ঘেঁষে বাংলাদেশের জমিতে মাদ্রাসার মালা সাজানো হয়েছে। এইসব মাদ্রাসার টাকার অভাব নেই। তারা বিনা পয়সায় ছাত্র পড়ায়, বইপত্র দেয়, আবাস ও খাদ্য জোগায়। পশ্চিমবঙ্গের অবৈধ মাদ্রাসাগুলির সঙ্গে স্থানীয় মাতব্বররা জড়িত। এইসব মাদ্রাসা জঙ্গি উৎপাদনের কারখানা বলে ব্যাপক ধারণা আছে। এতকাল পরে সেগুলির ওপর পুলিশ নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছে। তবে মাতব্বররা পুলিশের প্ল্যান ভেঙে দিতে চাইবেনই।

রাজ্যের গোয়েন্দাদের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকাগুলিতে হজি বড় ধরনের জাল বিস্তার করে ফেলেছে। আই এস আইয়ের পুরানো নেটওয়ার্ক তারা কাজে লাগাচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর মনে করছে, হায়দরাবাদের বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগ আছে। অন্য কয়েকটি রাজ্যের পুলিশ অভিযোগ জানিয়েছে, বাংলাদেশি জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গকে 'মরুদ্যান' রূপে বেছে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তরের অফিসারদের মতে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে এ রাজ্যে জঙ্গিদের পাকড়াও করতে পুলিশি অভিযান হয় না। রাজ্য পুলিশের ডিজি অনুপভূষণ ভোরা উলটো কথা শুনিয়েছেন। তবে উলটো কথা তাঁকে বলতেই হবে। এ রাজ্যের কোনও পুলিশ অফিসারেরই সত্য বলার সাহস নেই।



সেজন্যই রাজ্যের পুলিশকর্তারা ভুলেও স্বাকার করেননি, ভিন্ন রাজ্যের উর্দুভাষী ইমামরা এখানকার সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বহু খারিজি মাদ্রাসা ও মক্তব গড়ে বসেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর বামফ্রন্ট সরকারকে জানিয়েছে, ওই মাদ্রাসা ও মক্তবগুলি থেকেই জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ও জেহাদি উৎপাদন করা হচ্ছে। ওই মাদ্রাসা ও মক্তবগুলির এটাই প্রধান কাজ। ওই খারিজি মাদ্রাসাগুলির জন্য ট্রাস্ট বা হাওলার মাধ্যমে পেট্র-ডলার আসে। বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিরা এসে এইসব মাদ্রাসায় আশ্রয় নিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর বামফ্রন্ট সরকারকে আরও বলেছে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তঘেঁষা আটটি জেলায় প্রতি মাসে একটি করে ইসলাম শিক্ষণ আসর গজিয়ে উঠছে। বেশ কিছু মাদ্রাসা হঠাৎ বিশাল বিশাল বাড়ি বানাচ্ছে। সরকার এসব দেখেও দেখে না। মাদ্রাসাতে থেকেই শত শত মুসলিম যুবক জঙ্গি ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা নেয়। মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে পাকিস্তানের মানচিত্র ছেপে তার নীচে লেখা হচ্ছে; “চিনে নাও, এই তোমাদের দেশ।” এইসব মাদ্রাসার ওপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

যদি সরকার এইসব মাদ্রাসা ও মক্তবের ওপর বিন্দুমাত্র নজর দিতে যায়, তাহলে বড় বড় রাজনৈতিক পাণ্ডা রে রে করে তেড়ে আসবেন। এ বিষয়ে সিপিএম., কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস একই পন্থী। কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলিম জঙ্গিবাদকে কীভাবে উসকানি দিচ্ছে তার প্রতি সাম্প্রতিক একটি নজির দিচ্ছি।

গত রবিবার, ২ সেপ্টেম্বর বর্ধমান জেলার সংখ্যালঘু সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের চেয়ারম্যান এসএমএস হায়দার জিজ্ঞাসা করেছেন, বামফ্রন্ট সরকার তসলিমা নাসরিনকে আশ্রয় দিয়েছে কেন? ওই ইসলাম অপমানকারিণী মহিলাকে এখনই এ রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। সরকার যদি তা না করে, তাহলে রাজ্যের তিন কোটি মুসলমান মহাকরণ ঘেরাও করবে। সোনিয়া গান্ধী নিজে জনাব হায়দারকে কংগ্রেসের নেতা করে এ রাজ্যে পাঠিয়েছেন।

বর্ধমান জেলার পারাজ-পুরষা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাঘরে ওই সম্মেলন হয়েছিল। ওই সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান এবং নুরুল ইসলাম হায়দারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একই কথা বলেছে। হায়দারাবাদের মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের নেতাদের সঙ্গে এ রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের পার্থক্য কোথায়? ইমাম বরকতীর সঙ্গেই বা তাঁদের তফাত কোথায়? তাঁরাও তো তসলিমা নাসরিনকে খুন করতে চেয়েছে। অন্ধপ্রদেশের গোয়েন্দারা জানিয়েছে, মজলিস উত্তেহাদুল মুসলিমিন সন্ত্রাসবাদীদের রক্ষা করে, পুলিশের হাত থেকে তাদের বাঁচায়। তাদের সঙ্গে এ রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা সুর মেলান কেন?

সৌজন্যে দৈনিক বর্তমান (০৬-০৯-০৭)

## সংযোজন—২

## নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িকতা

সরকারের পুলিশ ও সিপিএমের হার্মাদবাহিনীর দানবীয় সন্ত্রাসের পর ‘ব্যাকফুটে চলে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রী এবার মুসলিম তাস খেলে নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মুসলমানদের মন জয় করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি মাঠে নামিয়েছেন দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারিকে। তিনি নাকি শান্তির বার্তা নিয়ে নন্দীগ্রামে গিয়েছেন। এই ঘটনাকে নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? নিজেদের হঠকারিতার জন্য বুদ্ধদেববাবুরা পশ্চিমবঙ্গের যে সর্বনাশ করেছেন, তা সংশোধনের চেষ্টা না করে তাঁরা এখন পির-ফকির-দরবেশ, তাবিজ-মাদুলির টোটকা খুঁজছেন। সিপিএম-পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের এত অধঃপতন প্রকাশ্যে এর আগে দেখা গিয়েছে কি?

দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম বুখারি সোমবার মহকরণে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ একান্তে আলোচনা করেছেন। আলোচনার শেষে সাংবাদিকদের বুখারি বলেছেন, “মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে জানলাম। ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামের পুলিশি গুলিচালনার ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রী দুঃখজনক বলে বর্ণনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, নন্দীগ্রামে আর জমি নেওয়া হবে না। ওখানে কেমিকেল হাবও হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে, নন্দীগ্রামে শান্তি ফেরা উচিত। আমি সেখানে গিয়ে শান্তির আবেদন জানাব।”

ইমাম বুখারির এই উদ্যোগে যে বুদ্ধদেববাবুর উদ্যোগ এবং সম্মতিতে হয়েছে, সে কথা মঙ্গলবার সিপিএমের মুখপত্র ‘গণশক্তি’তেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, “মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর বুখারি বলেন, মঙ্গলবার সকালে তিনি নন্দীগ্রাম যাবেন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীও সম্মতি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলেছেন যে, নন্দীগ্রামে শিল্পের জন্য কোনো জমি অধিগ্রহণ হবে না। নন্দীগ্রামের যে সমস্ত মানুষ এখনও বাইরে রয়েছেন, তাঁদের ফিরে আসতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুখারী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন সেখানকার মানুষকে আমি জানাবো।”

‘গণশক্তি’র এই রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রীর কথামতো, তাঁর আবেদন ও নির্দেশমতোই ইমাম বুখারি নন্দীগ্রামে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? তিনি কি কমিউনিস্ট পার্টির লোক? তিনি কি সিপিএম দলের লোক? তিনি কি এ রাজ্যের লোক? নন্দীগ্রামের পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর কি কোনও সম্পর্ক আছে? এ ব্যাপারে তাঁর কি কোনও রকম ধারণা আছে? অশান্তির আগুন নেভাবার কাজে দেশে-বিদেশে ইমাম বুখারির কোনও খ্যাতি আছে?

দিল্লির জামা মসজিদের ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারির এইসব কোনও গুণ আছে বলে কেউ জানেন না, কেউ কোনও দিন শোনেনওনি।

তাহলে বুদ্ধদেববাবু হাতে-পায়ে ধরে ‘আবেদন’ করে বুখারিকে নন্দীগ্রামে পাঠাচ্ছেন কেন?

কারণ ইমাম বুখারি মুসলমান এবং তিনি একজন মুসলিম নেতা। বুদ্ধদেববাবুর পুলিশ ও সিপিএমের হার্মাদবাহিনী নন্দীগ্রামে হিন্দুদের মতো বেশ কয়েকজন মুসলমানকেও হতাহত করেছে। জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের ঘরবাড়ি। বহু হিন্দু চাষির মতো সেখানে বহু মুসলমান চাষিও পাশবিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন, ঘরছাড়া হয়েছেন। নন্দীগ্রামে যদি শুধু হিন্দুরা মরতেন, অত্যাচারিত হতেন, তাহলে বোধহয় বুদ্ধদেববাবুর এত ‘ভুল স্বীকার’ এত শান্তির উদ্যোগ দরকারই হত না। সে জন্যই কি সিঙ্গুরে পুলিশ ও ক্যাডারবাহিনীর অত্যাচার, খুন-জখম নিয়ে বুদ্ধদেববাবুরা সেই ক্ষতে মলম লাগাতে ইমাম বুখারিকে ‘শান্তির দূত’ করে পাঠালেন না?

আজ কোনও বিজেপি-শাসিত রাজ্যে অনুরূপ ঘটনায় রাজ্য সরকারের কর্তারা যদি শঙ্করাচার্যকে শান্তির দূত হিসেবে ব্যবহার করতেন, তাহলে বুদ্ধদেববাবুরা কি শতমুখে তার নিন্দা করতেন না? সিপিএমের পেটোয়া বুদ্ধিজীবীরা কি তাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে গলা ফাটাতেন না?

নন্দীগ্রামের মুসলমানদের দলে টানার জন্য ইমাম বুখারিকে সেখানে পাঠিয়ে বুদ্ধদেববাবুরা যা করলেন, তাকে এক কথায় নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িকতা বলাই সম্ভব।

সৌজন্যে দৈনিক বর্তমান (১৩-০৬-০৭)



## কে এই শিবপ্রসাদ রায় ?

৭০-এর দশক এই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল ‘মুক্তির দশক’ স্লোগান কাঁধে নিয়ে। সারা বাংলা লাল হয়েছিল মানুষ খুনের রক্তে। আর ৭০-এর দশক যখন শেষ হল তখন দেখা গেল রক্তমাখা বামশাসন চেপে বসেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। যে লাল আফিম বাঙালি হিন্দুকে সেবন করানো শুরু হয়েছিল ২০-র দশক থেকে, সেই আফিমের নেশায় বঁদ হয়ে বাঙালি হিন্দু নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধ ও পিতৃপিতামহের প্রতি শ্রদ্ধাকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করে বিপন্ন করে তুলেছিল নিজের অস্তিত্বকে। নেশার ঘোরে সে ভাবতে লেগেছিল নিজের পায়ের নীচের মাটির থেকেও প্রগতিশীলতা বড়, মা-বোনের সম্রমের থেকেও ধর্মনিরপেক্ষতা বেশী দামী, বিবেকানন্দ-নেতাজী-ক্ষুদিরামের থেকেও লেনিন-স্ট্যালিন-মাও বেশী প্রাসঙ্গিক, নিজের মা-বাবার চেয়েও পার্টির নেতারা বেশী আপন। ঠিক সেই সময় ‘দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই’ নামক একটা সাজসজ্জাহীন চটি বই যেন বাঙালী হিন্দুর নেশাগ্রস্ত চেতনায় চাবুক হানল। সে প্রথমে চমকে উঠল। তারপর দুহাতে চোখ ঘসে উঠে বসল। ভাবতে লাগল, তাই তো একথা তো আগে মনে হয়নি। এই বইয়ের কথাগুলো যে মর্মাস্তিক সত্য কথা। এ যে বাঙালি হিন্দুর জীবন মরণের প্রশ্ন! তার চেতনা ফিরে এল।

‘দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই’ বইটির লক্ষ লক্ষ কপি সারা বাংলা ছেয়ে গেল। রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গেল আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং যেখানেই বাঙলাভাষীরা থাকে। তারপর অনুবাদ হল ভারতের প্রায় সবকটি ভাষায়। তারপর ইংলন্ড-আমেরিকা পাড়ি দিল চটি বইটি। ইতিমধ্যে ঐ অখ্যাত লেখক শিবপ্রসাদ রায়ের হাত থেকে বেরোতে লাগল একের পর এক বই—সময়ের আহ্বান, আমরা ও তোমরা, আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও। রহস্যময় আর এসএস, আমি স্বামীজী বলছি, চতুর্ভুজ, অনুপ্রবেশ, ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালী হিন্দু জাগ্রত হল, তারপর উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিন্দুত্ব আন্দোলনে। শহরে, গ্রামে হাটে-বাজারে খুঁজতে লাগল কোথায় আছে হিন্দু

সংগঠন? কেউ খুঁজে বের করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে, কেউ পৌঁছে গেল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয়ে, কেউ বা বাঁপিয়ে পড়ল বিজেপি-র কাজে। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বইতে লাগল হিন্দুত্বের প্রবল জোয়ার। সেই গৈরিক জোয়ারের আঘাতে ফিকে হয়ে গেল বাঙালি হিন্দুর আফিমের লাল নেশা। 'এই বাংলা থেকে একটা ইঁটও অযোধ্যায় যেতে দেব না'—এই দন্তোক্তি, রক্তচক্ষু ও লাল শাসানিকে অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার 'রামশিলা' বাংলার হাজার হাজার গ্রামে-শহরে সাড়ম্বরে পূজিত হয়ে রওনা দিল শ্রীরামের জন্মস্থান অযোধ্যায় পথে, এই রাজ্যেরই পুলিশ প্রশাসনের এসকটে।

মানুষ খুঁজতে লাগল কে এই অজানা-অনামা লেখক শিবপ্রসাদ রায়? কোথায় থাকেন? জানা গেল এই শিবপ্রসাদ রায় থাকেন বর্ধমান জেলার কালনা শহরে। অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, কিশোর বয়স থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক। অনেকদিন সংঘের প্রচারক ছিলেন। পরে ছিলেন জনসংঘের কর্মী। জরুরী অবস্থায় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রথাগত শিক্ষা প্রায় কিছুই ছিল না। ছিল শুধু হিন্দুত্ব আদর্শের তীব্র প্রেরণা ও ব্যক্তি জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা। এইটুকু সম্বল করেই এই লাল বাংলায় তিনি বাজিয়েছিলেন হিন্দুত্বের পাঞ্চজন্য শঙ্খ। হিন্দু বাংলার মর্মস্থলে তিনি নাড়া দিয়েছিলেন।

পরিচিতি হওয়ায় পর তাঁর ডাক পড়েছিল সর্বত্র। পশ্চিমবঙ্গে ও বাইরে। সব জায়গায় গিয়ে তাঁর যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ অনর্গল ভাষণের মাধ্যমে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন হাজার হাজার শ্রোতাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একাধারে লেখক ও বাগ্মী।

আমাদের সকলের আপন শিবুদা আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। অকৃতদার শিবুদা নিজ পরিবারের জন্য (বিধবা মা এখনও জীবিত) রেখে যাননি এক কপর্দকও। শুধু রেখে গেছেন তাঁর অজস্র বই, লেখা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত ভক্তকে। তারাই বহন করবে শিবুদার জীবনব্রত—হিন্দুত্ব আন্দোলনের গৈরিক পতাকাকে।

তপন কুমার ঘোষ

কেশব ভবন

কোলকাতা

৬ই জুলাই—২০০১